

নাম: গঙ্গা চরন রাজবংশী

জন্ম তারিখ: ৮ জুন, ১৯৬৬

শহীদ হওয়ার তারিখ: ৫ আগস্ট, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা : ড্রাইভার

শাহাদাতের স্থান : রামপুরা ব্রীজ, রামপুরা, ঢাকা

শহীদের জীবনী

একজন শ্রমজীবী নাগরিক, যিনি রাষ্ট্রীয়

নিপীড়নের ছায়ায় ঢেকে গেলেন

গঙ্গা চরন রাজবংশী একটি নাম, এতদিন পর্যন্ত ছিল শুধু এক পুরনো হাইভিজ জ্যাকেটে আটকে থাকা চালকের পরিচয়পত্রে লেখা কিছু শব্দ। একটা নাম, যার ওজন ছিল না রাষ্ট্রের কোনো নথিতে, যার অস্তিত্ব ছিল না সমাজের গর্বের তালিকায়। আজ, মৃত্যুর পরে, সে নামটিই হয়ে উঠেছে এক নীরব বিবৃতি। প্রতিবাদের প্রতীক, যন্ত্রণা ও অবহেলার প্রতিচ্ছবি। জন্ম ৮ জুন ১৯৬৬, পিতা কালু লাল রাজবংশী, মাতা নিপদা রাজবংশী। এই পৃথিবীতে তাঁর আগমন ছিল নিঃশব্দ, তাঁর বিদায়ও হলো এক অবর্ণনীয় নীরবতায়। পেশায় তিনি ছিলেন একজন ড্রাইভার। তা কোনো গর্বের পেশা নয় এই সমাজে। কিন্তু তাঁর গর্ব ছিল তাঁর পরিবার। পরিবারটি থাকত ঢাকার বৈঠাখালি, মধ্য বাড্ডার ভাঙাচোরা এক ভাড়া বাড়িতে। যেখানে টিনের চাল ফুটো হলে বর্ষায় ঘরের ভিতরে ফোঁটা ফোঁটা করে জমত কষ্টের জল। যেন কোনরকম দিনাতিপাত। কোনো কিছু হাতে এলে রান্না হত, না এলে ঘরের বাতি নিভে যেত অনাহারের অন্ধকারে। কেউ জানত না তাঁদের গল্প, কেউ শুনত না তাঁদের কান্না। কারণ এই পরিবার “গরিব”, আর গরিবদের গল্প হয় না। গরিবরা শুধু সংখ্যা।

তাঁর বড় ছেলে মিঠু রাজবংশী, বয়স ৩২, এখনো বেকার। ছোট ছেলে বিশ্বজিৎ (২৫) বি.এ পড়ছে আবুজর গিফারী কলেজে। পড়ালেখার খরচ যোগাতে বাবাকে কত রাত, ভোর পর্যন্ত বাস চালাতে হয়েছে সেই ক্লান্তির হিসেব কোনো নথিতে নেই। সরকারের চোখে কিংবা সংবাদপত্রের পাতায়ও নেই। শুধু ছিল এক নিঃসঙ্গ হৃদয়ের ব্যস্ততা ও পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর সংগ্রাম।

আর তারপর হঠাৎ একদিন, এক গুলির শব্দ থামিয়ে দিল সেই সংগ্রাম। গঙ্গা চরন শহীদ হলেন, তবে কোনো স্বীকৃতি ছাড়া, কোনো তদন্ত ছাড়া। পোস্টমর্টেম হয়নি কারণ তিনি “ড্রাইভার”। তাঁর লাশ নিয়ে পরিবার থানায় গেলে পুলিশ আমলে নেয়নি। শেষে কাউন্সিলরের সুপারিশপত্র নিয়ে শাশানে যেতে হয়। মৃত্যুর পরেও তাঁকে “যাচাই করে” মরতে হয়। রাষ্ট্র তাঁকে চিনল না, সমাজও নয়। অথচ তাঁর রক্তে মিশে আছে মধ্যবিত্তের নীরব ক্রন্দন, নিম্নবর্গের আত্মনাদ। এই মৃত্যু শুধু একটি দেহ থামায় না। এই মৃত্যু থামিয়ে দেয় শ্রেণীসংগ্রামের এক অলিখিত ইতিহাস। সে ইতিহাসে লেখা থাকে, কীভাবে এক মানুষকে জীবদ্দশায় উপেক্ষা করা হয়, আর মৃত্যুর পরেও তাঁকে প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয় না। গঙ্গা চরন রাজবংশী আজ নেই, কিন্তু তাঁর নাম লেখা রইল। একটি হারিয়ে যাওয়া শ্রেণির প্রতিনিধি হয়ে, নীরব শহীদের তালিকায়, যেখানে প্রতিটি নাম একেকটি অজানা অভিলাষ হয়ে বাতাসে ভাসে।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

গঙ্গা চরনের মৃত্যু কোনো দুর্ঘটনা ছিল না। এটি ছিল একটি রাষ্ট্রীয় লাশের রাজনীতি। নরম জুতোয় হাঁটা এক নির্মম ফ্যাসিবাদের নগ্ন উদাহরণ। ২০২৪ সালের জুলাই, বাংলাদেশের ইতিহাসে রক্তমাখা একটি মাস। সেদিনের রোদ যেন ছিল বিদ্রোহের আগুন জ্বলা, বাতাসে মিশে ছিল দীর্ঘদিনের চাপা কান্না। ১৫ বছরের আওয়ামী শাসন তখন সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে। দুর্নীতি, গুম, ভোট ডাকাতি, বিচারহীনতার মহোৎসব চলছিল খোলাখুলি। আদালত ছিল বন্দি। সাংবাদিকেরা নিঃশব্দ। আর পুলিশ বাহিনী যেন ক্ষমতার বেসরকারি আর্মি।

এই নিপীড়নের বিপরীতে উঠে দাঁড়িয়েছিল কোটা সংস্কার আন্দোলন। প্রথমে নেহাত ছাত্রদের দাবি মনে হলেও, তাতে খুব দ্রুত রক্ত মিশে যায় দেশজুড়ে সাধারণ মানুষের। কেননা এই আন্দোলন ছিল শুধুই শিক্ষানীতির জন্য নয়, এটি ছিল সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক ব্যথিত চিৎকার। শহীদ আবু সাদ্দদের রংপুরে হত্যার পর, আর তা ছাত্রদের আন্দোলন থাকে না—তা হয়ে ওঠে এক গণবিদ্রোহ। শ্রমজীবী, বেকার, শিক্ষক, নার্স, অবসরপ্রাপ্ত সেনা, দিনমজুর, এমনকি রিকশাচালকও তাতে শরিক হন। এই আন্দোলনের উত্তাপে জেগে উঠেছিল গঙ্গা চরনের মতো মানুষ, যাদের প্রতিদিনই এক জীবনমরণ যুদ্ধ।

গঙ্গা চরণ যিনি কোনো সংগঠনের নেতা ছিলেন না, কোনো দলীয় কর্মী ছিলেন না। তিনি ছিলেন সেই নিরব বিপ্লবীর প্রতিচ্ছবি, যার শরীরে ঘাম জমত সারাদিনের পরিশ্রমে, আর মন ভেঙে যেত ছেলের মুখে খাবার না দিতে পারলে। কিন্তু তাঁর হৃদয় বুঝেছিল এই লড়াই শুধু কোটা সংস্কারের না, এটি বৈষম্যের বিরুদ্ধে, এটি সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, যে রাষ্ট্র সবসময় গরিবকে গোনে না, খেয়াল করে না, শেষমেশ গুলি করে থামিয়ে দেয়।

তাই তিনি দাঁড়িয়েছিলেন হয়তো একা, হয়তো নিরবে। কিন্তু দাঁড়িয়েছিলেন সেই দিন দক্ষিণ বনশ্রীর মোড়ে, যেখানে ছাত্রদের মিছিল হঠাৎ থমকে গিয়েছিল পুলিশের ব্যারিকেডে। সেখানে গুলি চলে। আর সেই গুলি লাগে গঙ্গা চরণের ঠোঁটের বাঁ পাশে। কেউ জিজ্ঞেস করেনি কেন তিনি সেখানে ছিলেন। রাষ্ট্র জবাব দেয়নি কিন্তু উত্তর ছিল রক্তে লেখা। তিনি ছিলেন— কারণ এটা তাঁর লড়াইও ছিল। রুটি, ন্যায্যতা, সম্মান, এবং জীবিত থাকার অধিকার এই সব কিছুর জন্যই তিনি নেমেছিলেন রাস্তায়।

এ দেশে এখন দাঁড়ানোতেও গুলি লাগে। প্রশ্ন করলেও গুলি লাগে। কিছু না করলেও গুলি লাগে, যদি তুমি গরিব হও, শ্রমিক হও, দলবিহীন হও। গঙ্গা চরণের মৃত্যু সেই নির্মম বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। যেখানে লাশ পড়ে থাকে রাস্তায়, কিন্তু ইতিহাস জেগে ওঠে জনতার হৃদয়ে। জুলাইয়ের বিদ্রোহ ছিল গঙ্গা চরণেরও

বিদ্রোহ। একজন সাধারণ মানুষের বুক দিয়ে লেখা অসাধারণ প্রতিবাদের কাহিনি।

এই আন্দোলনের ইতিহাস তাঁকে কখনো ভুলবে না, যেমন করে বাতাস ভুলে না ঝড়ের গর্জন।

যেভাবে শহীদ হন

১৮ জুলাই, ২০২৪। ঢাকার রামপুরা ব্রিজ তখন বিপ্লবের ঝাঁবে উত্তপ্ত। চারদিকে পুলিশের ঘিরে রাখা রাস্তা, ছাত্রদের মিছিলের গর্জন, আর মাথার ওপরে নির্দয় সন্ধ্যার ছায়া। শহর যেন দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একদিকে শোষণ, অন্যদিকে প্রতিবাদ। আর ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন গঙ্গা চরন রাজবংশী। একজন নিরীহ শ্রমিক, যিনি হয়তো সেদিন বাসা ফিরছিলেন, অথবা থেমে দাঁড়িয়েছিলেন কিছু সময়ের জন্য, দেখে নিতে কী ঘটে যাচ্ছে তাঁর দেশটাতে।

তাঁর হাতে ছিল না কোনো ব্যানার, মুখে ছিল না কোনো স্লোগান, তবুও গুলি এসে লাগে তাঁর শরীরে। হঠাৎ এক এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণে হঠাৎ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। রক্তে ভেসে যায় রাস্তাটুকু। চারপাশের হাহাকার আর পুলিশের বুটের শব্দ মিলে এক বিভীষিকাময় গর্জনে রূপ নেয়।

তবে মৃত্যু তাঁর জন্য সহজ আসেনি। গঙ্গা চরন লড়েছেন, ১৮ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত টানা ১৮ দিন। এই সময়টা ছিল এক নীরব যুদ্ধক্ষেত্র, আইসিইউর নিঃসঙ্গতা, দেহের প্রতিটি কোষের সঙ্গে লড়াই, রাষ্ট্রের নির্লিপ্ততা, এবং পরিবারের হতবিস্বল কান্নার এক নির্মম প্রেক্ষাপট। চিকিৎসা ঠিকভাবে হয়নি, সংবাদমাধ্যম তেমন কিছু বলেনি, পুলিশ তো একবারের জন্যও মুচকি ক্ষমাও চায়নি।

তাঁর সন্তানেরা হাসপাতালের করিডোরে কেবল প্রার্থনা করে গেছে, "আব্বা একটু চোখ মেলে দেখেন, আমরাই আছি।" কিন্তু সাড়া আসেনি। চিকিৎসা ব্যয় চালাতে গিয়ে পরিবার দেউলিয়া। রক্ত দিলেন প্রতিবেশীরা, ওষুধের পয়সা জোগাতে বন্ধক পড়লো স্ত্রীর সোনার কানের দুল। কিন্তু রাষ্ট্র? রাষ্ট্র ছিল নিঃশব্দ, যেন এ মৃত্যুতে তার কিছু যায় আসে না।

৫ আগস্ট, ২০২৪, একটি শববাহিনী হাসপাতাল ছাড়ে, যেখান থেকে জীবিত কেউ আর ফিরবে না জানে সবাই। কোনো রাষ্ট্রীয় শোক নেই, নেই কোনো প্রতিবাদের ব্যানার, কেবল ছোট করে লেখা, "ড্রাইভার গুলিতে আহত, ১৮ দিন পর মারা যান" সংবাদপত্রের এক কোণে।

পুলিশ এই মৃত্যু নিয়ে তদন্ত করেনি। মৃত্যুর পরও পরিবারকে লাশ নিয়ে করতে হয় দরজায় দরজায় ঘোরা। থানা নেয়নি, হাসপাতাল চাপ দেয় না বলতে, শেষে কাউন্সিলরের লিখিত অনুমতি নিয়ে পোস্টাগোলা শাশুনে দাহ করতে হয়। এই মৃত্যু শুধু একটি জীবন থামায়নি, থামিয়েছে আমাদের সভ্যতার মুখোশটাও।

একজন মানুষ যখন রাস্তায় গুলি খায়, ১৮ দিন বাঁচার চেষ্টা করে, আর আমরা কেবল তাকিয়ে থাকি—তখন বুঝতে হয়, বিপ্লব দরকার। এই মৃত্যু কেবল একটি ট্রাজেডি নয়, এটি রাষ্ট্রীয় পাপের ক্যানভাসে আঁকা এক অসীম আত্মনাদ। গঙ্গা চরন ছিলেন না কোনো রাজনৈতিক নেতা, ছিলেন না কোনো সংগঠনের মুখপাত্র—তবু তিনি হয়ে ওঠেন বিপ্লবের সলিলচিত্র।

তাঁর মৃত্যুর প্রতিটি মুহূর্ত যেন বলে— "তোমরা চুপ করে থেকো না। কারণ কাল তোমার গায়েও লাগতে পারে সেই গুলি, যেটি আজ গঙ্গা চরনের শরীর ভেদ করে গেছে।"

পরিবার ও বেদনাভরা বাস্তবতা

পরিবার ও বেদনাভরা বাস্তবতা, এই শব্দগুলো যেন মিথ্যে এক মধুরাস, যা গঙ্গা চরন রাজবংশীর পরিবারের কাছে পৌঁছতে পারে না, বা পৌঁছালেও তাতে কিছু পরিবর্তন হয় না। "নাজুক" বলার মাধ্যমে আমরা যেন তাদের করুণ অবস্থার ঠিক মূলে হাত দিতে পারি না, আসলে সত্যিটা সে চেয়ে অনেক গভীর, অনেক ধ্বংসস্তূপের গন্ধ মিশানো। গঙ্গা চরন রাজবংশীর পরিবার আজ অস্তিত্বের খামারে যেন একটা ম্লান আলো হিসেবে টিকে আছে, যা গলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে হতাশা আর দারিদ্র্যর চাপে।

তিনটি ছোট প্রাণ, তাদের চোখে এখন কেবল অন্ধকারের রাজত্ব। বড় ছেলে মিঠু, তরুণ বয়সে কাজের অভাবে হেঁটে বেড়ায় একটি ভিন্ন পৃথিবীর সন্ধান, যেখানে লাঠির বদলে একটা লেন্স থাকে, যেখানে রুটি থেকে বেশি কিছু জোটে, কিন্তু সে পৃথিবী যেন তাঁর জন্য ছিল না। আর ছোট ছেলে কলেজের ক্লাসরুমে বসে শূন্যতার মধ্যেই হারিয়ে যাচ্ছে। একটা ভবিষ্যৎ, যা আজ শুধুই কফিনের স্মৃতির ছায়ায় ঢাকা।

গঙ্গা চরনের ভাই নিশার মুখ থেকে যখন বেরিয়ে আসে সৎকারের স্মৃতি, সেই মুহূর্তে যেন সমস্ত রক্তক্ষরণের ব্যথা মিশে যায় গলায়। থানায় গিয়ে যখন তারা সাহায্যের আশায় হাত বাড়িয়েছিল, তখন পুলিশ তাদের দৃষ্টি ছিল কেবল কাগজের ফাঁকে। ময়নাতদন্তের আদর্শ কথা তো দূরের কথা, সেখানে গঙ্গার রক্তের কোনো হিসাবও নেওয়া হয়নি। কাউন্সিলরের একটি সনদ দিয়েই তারা সৎকার সম্পন্ন করেছে। যা রাষ্ট্রের এক কঠোর ঘোষণা, "আমরা তোমাদের মৃত্যু স্বীকার করি না।"

এই অবহেলা, এই নিঃশব্দ উপেক্ষা যা আজকের সমাজের নিম্নবিত্তের কষ্টের প্রতিচ্ছবি, সেখানে গঙ্গার পরিবার যেন একাকী। চাঁদার কোন দরকার নেই তাদের, প্রতিদানের কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, শুধু চাই শান্তি, চাই ন্যায়বিচার, চাই সম্মান। একটি প্রাথমিক মানবিক অধিকার, যা রাষ্ট্রকে তাদের দিতে হবে। গঙ্গা চরন ছিলেন কোনো রাজনৈতিক নেতা না, ছিলেন না কোনো দলের মুখ; তিনি ছিলেন জনতার একজন অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর শরীরের গুলির চিহ্ন সেই গল্প বলে দেয়। জনতার রক্তেই লেখা আছে ইতিহাসের সব অধ্যায়, কিন্তু আজ সেই রক্ত মাটির মধ্যে ঝরে যায় অজানায়, অস্বীকৃতিতে। তার সন্তানদের জীবনের ওপর ভর করে এখন রাষ্ট্রের বিবেক। তারা বাঁচবে কি না, তারা পাড়ি দেবে কি না এই অন্ধকারের থেকে, সেটা এখন আমাদের হাতে। সমাজের নীরবতা, রাষ্ট্রের অবহেলা যদি কাটিয়ে ওঠা যায়, তাহলে হয়তো তারা ফের পাবে জীবনের আলো, নয়তো তারা হারিয়ে যাবে আমাদের ভুলে যাওয়া নিকট অতীতে, একটি শোকের ছায়ায়।

এভাবেই নিপদা রাজবংশীর চোখে ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে স্বপ্ন, নিঃশব্দ নিঃসঙ্গতার মাঝে প্রতিটি দিন কেটে যায় কেবল বেদনার সুরে। পরিবারটির জীবনে আজ শুধু রক্তের স্মৃতি, আর সেই স্মৃতির জ্বালা, যা সময়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে গভীর হচ্ছে, আর আমাদের সভ্যতার প্রতিচ্ছবি হয়ে রয়ে যাচ্ছে। যেখানে মানবতার শেষ সীমা লগ্নভঙ। এতটাই নিষ্ঠুর এই বাস্তব, যে যেখানে এক মানুষের মৃত্যু আজ হয় অস্বীকৃতির কারণ, সেখানে আমরা সবাই হারিয়ে যাচ্ছি মানবিকতার গ্লানি আর অবহেলার জালে।

প্রস্তাবনা ও শহীদের উত্তরাধিকার

গঙ্গা চরন রাজবংশীর শহীদত্ব যেন কখনো হারিয়ে না যায় গুলির ধোঁয়ার আঁধারে, যেন তার নাম শুধু স্মৃতিপটে নয়, জীবন্ত অনুপ্রেরণার আলো হয়ে জ্বলজ্বল করে থাকে। এই মানুষটির আত্মত্যাগ আমাদের প্রত্যেক দিন সতর্ক করে দেয়। সাধারণ মানুষের জীবন রাষ্ট্রের কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাদের অস্তিত্বও সমান মূল্যবান, তাদের বেদনা ও স্বপ্নও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তাঁর সন্তানেরা যেন অচেনা, অজানার কোণে হারিয়ে না যায়, সেই জন্য জরুরি সরকারি বৃত্তির মাধ্যমে তাঁদের পড়াশোনার পথ সুগম করা। শুধু বইয়ের পাতা নয়, তাদের ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা, যেখানে তারা যেন অনুপ্রাণিত হয়, স্বপ্ন দেখে, এবং নিজের ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছায়।

শহীদ সন্তানের জন্য আর্থিক সহায়তা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হোক যেন তা হয় রাষ্ট্রের কর্তব্য, ন্যায়ের মুখপাত্র। এই সহায়তা যেন করুণা বা দয়ালু

